



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 215 – 227
Website: <https://www.tirj.org.in>, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা : মধ্যযুগীয় অসাম্প্রদায়িকতা

উজ্জ্বল মণ্ডল

গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া

স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার

ইমেইল : umondal0968@gmail.com

Keyword

অর্বাচীন-ব্রতকথা, ব্রতকারগণ, সত্যনারায়ণ-সত্যপীর, হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্ক, আপোসমুখী-সাহিত্য, পীর-মাহাত্ম্য গাথা, ধর্মীয় মেরুকরণ, সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি, সংকট-সম্ভাবনা-সামঞ্জস্য।

Abstract

বর্তমান সময়ে 'অসাম্প্রদায়িকতা' শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখেনা। শুধু ভারত নয়, গোটা পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ দিনের পর দিন মারাত্মক আকার নিচ্ছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO) সেখানে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক-দলগুলি সাম্প্রদায়িকতাকেই একমাত্র হাতিয়ার করে এগিয়ে যেতে চাইছে। এ ইতিহাস আজকের নয়, শতাব্দী-প্রাচীন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তুর্কি-আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক-সম্পর্ক খুব-একটা ভালো ছিলনা। পরে অবশ্য ছবিটা পাল্টায়। শাসকের অত্যাচারের বর্ণনা পাই রামাইপণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ', বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা' ইত্যাদি গ্রন্থে। অন্যদিকে হিন্দুধর্মে, সংখ্যাগরিষ্ঠ-নিম্নবর্ণ সংখ্যালঘু-উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের অমানবিক অত্যাচারের শিকার ছিল। শাসক ছিল উচ্চবর্ণ। তুর্কি-আক্রমণের ফলে সামাজিক অবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন এল। তখন থেকেই বঙ্গদেশে তুর্কি সিয়া-সম্প্রদায় জায়গা জুড়ে বসেছিল। ইসলাম ধর্মপ্রচারকেরা নতুন একটি বিশ্বাসের জগৎ তৈরি করে দিয়েছিল বঙ্গসমাজের বুকে। সমাজ উপলব্ধি করল হিন্দুদের দেবতা কতখানি নিষ্ক্রিয়, মিথ্যে; মূর্তিপূজা ভগ্নামির পুতুলমাত্র। তাই শুধুমাত্র ভয়ে নয়, পীর-দরবেশদের উদার-ধর্মীয় প্রচার বিনা-রক্তপাতে বঙ্গদেশের অগণিত মানবহৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এমতাবস্থায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে বিধর্মীদের স্বধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ কাছাকাছি আসার সুযোগ পেল। লেখা হল মঙ্গলকাব্য, অনুবাদকাব্য এবং অপ্রধান-পাঁচালীকাব্যসমূহ। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল, অনেক মুসলমান লেখকও হিন্দুদের কাব্য-সাহিত্যকে আপন করে নিল। তারাও মঙ্গলকাব্য রচনা করতে উদ্যোগী হল। ইসলামি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা নসরুল্লার লেখা 'জঙ্গনামা'। যেখানে মহাভারতের আদলে ইসলাম ধর্মপ্রচারকদের যুদ্ধকাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণরাঢ়ের লেখকদের মধ্যে অন্যতম গরিবুলা লিখলেন 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য। সৈয়দ হামজার নামেও মঙ্গলকাব্য আছে। অর্থাৎ ইসলাম-ধর্মানবলম্বীদের মনেও হিন্দুদের দেবমহিমা-সূচক আখ্যান জায়গা করে নিচ্ছিল তাদেরই অজ্ঞাতসারে। এমনকি মুসলমান শাসকেরাও হিন্দুধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী হয়ে হিন্দু-কবিদের কাব্যরচনা করবার জন্য নির্দেশ দিতে লাগলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম ও বহিরাগত ইসলামধর্ম তখন থেকেই সহাবস্থান করতে শুরু করে। চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যেও আমরা এই ধর্মীয়-সম্প্রীতির উল্লেখ পাই।

‘সত্যনারায়ণ ব্রতকথা’ও সেই সামাজিক-সম্প্রীতির কথা বলে। যা আজও সাহিত্যপাঠকের নজরে সেভাবে আসেনি। আজও দক্ষিণবঙ্গের ঘরে-ঘরে ‘শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী’ পাঠ ও সির্পি খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। ধর্মীয় ভেদাভেদের সীমানা পেরিয়ে চূড়ান্ত মানবিকতার কথা বলেন ভগবান সত্যনারায়ণ ওরফে সত্যপীর। অনেক কবিকেই পাই সত্যনারায়ণ পালার রচয়িতা হিসাবে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা মধ্যযুগের দুজন প্রতিনিধি-স্থানীয় কবির রচনাকেই গ্রহণ করেছি। তাঁরা হলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও ভারতচন্দ্র রায়।

Discussion

১

বাংলাদেশে পীরমাহাত্ম্য রচয়িতা প্রায় পঞ্চাশাধিক কবির নাম পাওয়া যায়। সুকুমার সেনের মতে দ্বিজ গিরিধরের নিবন্ধই প্রাচীনতম পাঁচালী। উত্তরবঙ্গের হিন্দুকবি কৃষ্ণ হরিদাসের লেখা ‘সত্যপীরের পাঁচালী’ পাঁচালীগুলি মধ্যে বৃহত্তম এবং বিচিত্রতম। তাঁর গুরু আবার একজন ইসলাম-ধর্মের মানুষ। তবে শুধু হিন্দু কবির নয় অনেক মুসলমান কবিও ছিলেন। শেখ ফৈজুল্লা রচিত কাহিনি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাহিনির সঙ্গে অভিন্ন। তিনিও দক্ষিণরাঢ়ের লোক। ফকীর মহম্মদের লেখা ‘মানিকপীরের গীত’ নামক পুঁথি পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গে। রচনাকাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। সেই সময় ধর্মে ও সংস্কৃতিতে বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান কতটা এক হয়ে এসেছিল তার উল্লেখ পাই শেখ ফৈজুল্লা কাব্যের বন্দনা অংশটিতে। আল্লা, মোহম্মদ-মুস্তাফা ও অন্যান্য পীরদের বন্দনা করার পর তিনি হিন্দুর ঠাকুরগণকেও বন্দনা করেছেন। এছাড়া সুন্দরবনের ‘মউল্যা’ সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ছিলেন। অস্ট্রিক-মোগল জাতির অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রমানব অপদেবতা কালক্রমে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত হয়েছেন। হিন্দুরা এই কাহিনি নিয়ে লিখলেন ‘রায়মঙ্গল’; অন্যদিকে মুসলমানকবিরা লিখলেন ‘গাজী সাহেবের গান’। তবে সত্যপীরের কাহিনী বলতে গিয়ে সকলেই ধর্মসম্প্রদায়গত মানসিক ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। সুকুমার সেনের মতে,

“মক্কার রহিমকে অযোধ্যার রাম বলে স্বীকার করে বহু হিন্দু কবি সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর পাঁচালী লিখেছিল।”

আবার মুসলমানকবিরা তাদের কাব্যে হিন্দু দেবদেবী ও চৈতন্যদেবের বন্দনা করেছেন। কোথাও আবার আল্লাহ ও ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে একান্বিত করেই দেখিয়েছেন। তারমধ্যে দক্ষিণরাঢ়ের আরিফ ছিলেন প্রধান। রামেশ্বরের সত্যপীরের ব্রতকথা একসময় কিছু জনপ্রিয় হয়। ১৬৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কাব্যটি লেখা বলে মনে করা হয়। পরে কাব্যটি বটতলা থেকে একাধিকবার মুদ্রিত হয়। এছাড়া ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে’ জায়গা করে নেয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘সত্যপীরের কথা’। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত ‘সত্যনারায়ণ ব্রতকথা’ও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অপর একজন শক্তিধর কবি হলেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। নিতান্তই কিশোর বয়সে তিনি সত্যপীরের-মাহাত্ম্য বিষয়ে দুটি অতিক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করেন এবং তৎক্ষণাৎ সভামধ্যে পাঠ করেন। এরমধ্যে একটা পুঁথি ১৭৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। অপরটির রচনাকাল জানা যায়না। ‘সত্যপীরের কথা’ তাঁর প্রথম রচনা বলে পরিচিত। এটি ত্রিপদী-ছন্দে লেখা। অন্যটি অষ্টমঙ্গলার চণ্ডে চৌপদী-ছন্দে লেখা। মনে রাখতে হবে সত্যপীরের উদ্ভাবক রামেশ্বরও নন, ভারতচন্দ্রও নন। তাদের সমকাল ও পরবর্তীকালে অনেকেই সত্যপীর-সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখেছেন। আজও অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তবে একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই যে, অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক কবির নাম পাওয়া গেলেও রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের নাম বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় বিশেষভাবে আলোচিত হবে। কারণ তাঁদের জনপ্রিয়তা, একাধিক সম্পাদনা ও অগণিত মুদ্রণ-সৌভাগ্য।

২

প্রাথমিক ভাবে বিষয়টি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা হলেন ডঃ আহমদ শরীফ ও শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন। ফৈজুল্লা কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন,

“এঁর পাঁচালী, ‘সত্যপীরের পুস্তক’, লেখা হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান দু’সম্প্রদায়েরই জন্য। তাই উপক্রমে মুসলমানের ও হিন্দুর উপাস্য সমানভাবে বন্দিত হয়েছে।”^২

শিশিরকুমার দাশ মধ্যযুগের ভারতীয় কাব্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ ও দেব-মানব সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক এভাবে,

“He wants to capture the intensity and the beauty of each moment of his realization and experience of the divine presence in history. He finds the short verse to be the most convenient form to celebrate the glory of God. God appears before him not with his cosmic splendour and boundlessness but in intimate forms and in familiar and homely situations. The infinite God takes a finite form but the devotee is not unaware of His infinitude. The greatness and glory of the infinite can be discovered in the most trivial of situations. Every situation and every moment of the man.”^৩

ভগবান সত্যনারায়ণের কথা লোকসমাজে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। বিশেষত হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এই ব্রতকথার মধ্যদিয়ে। আমাদের ধর্ম-সাধনায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে যথাক্রমে সৃষ্টি, রক্ষা বা পালনকর্তা ও ধ্বংসের দেবতারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আদিতে এদের পৃথক অস্তিত্ব ছিল। যেমন বৈদিক ‘আদিত্য বিষ্ণু’; উপনিষদের ‘বাসুদেব-কৃষ্ণ’ এবং মহাভারতের শান্তিপর্বের ‘নারায়ণ’। অথচ কালক্রমে এরা একীভূত হয়েছে। কারণ নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের দশম অধ্যায়ে ও মহানারায়ণ-উপনিষদের বিষ্ণুগায়ত্রী মন্ত্রে নারায়ণ, বাসুদেব ও বিষ্ণু এই তিনটি নাম একসঙ্গে পাওয়া যায়। এবং সেখানে তিনটি নাম আসলে একই দেবতার। মন্ত্রটি হল ‘ওঁ নারায়ণায় বিদ্বাহে, বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।’ আসলে বিষ্ণুর একটি রূপকেই সত্যনারায়ণ বলে পূজা করা হয়। বিষ্ণু মন্ত্রে বলা হয়েছে, ‘মঙ্গলম্ ভগবান বিষ্ণুঃ মঙ্গলম্ গরুড়ধ্বজঃ।/মঙ্গলম্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ মঙ্গলায় তনো হরিঃ।।’ রামেশ্বরের ‘সত্যনারায়ণ ব্রতকথা’য় আছে, ‘গুরুং গণপতিং গৌরীং গঙ্গেশং গরুড়ধ্বজম্।/নত্বা শ্রুত্বা সুচরিতং প্রাহ রামেশ্বরঃ সুধী।।’^৪ বিনতা-পুত্র গরুড় বিষ্ণুর বাহন। অদিতির দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। এখানে ‘গরুড়ধ্বজ’ বলতে বিষ্ণুকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সত্যনারায়ণের অপর অর্থ হল সংসারে একমাত্র নারায়ণই সত্য, বাকী সব মায়া। সত্যকে অনুসরণ না করলে কী ধরনের সমস্যা পড়তে হয় বা সত্যচরণের মাধ্যমে কী করে সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে সেটাই এই কাহিনির মূল উপজীব্য। সত্যপীরের উদ্ভবতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় আহমদ শরীফের বক্তব্যকে উদ্ধার করতে চাইব, “মুঘল বিজয়ের পরে বিয়াল্লিশ বছর ধরে সামন্ত সম্রাটের দ্বন্দ্বিক অবস্থান, নৈরাজ্য আর যুরোপীয় বেনেদের নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির প্রভাব, মগ-হার্মাদদের নদীপথে লুণ্ঠতরাজ এবং মুঘলদের সাম্রাজ্যিক শোষণ প্রভৃতি জনজীবনকে দুর্বল করে তুলেছিল। গাঁয়ে-গঞ্জে ব্যক্তিজীবনে সমাজের কিংবা সরকারের উপর ভরসা করার কিছু ছিল না, জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা ছিল না বলেই মানুষকে সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন শঙ্কিত থাকতে হত। এমনি অবস্থায় গীতায়-কোরআনে ভরসা, মহৎ তত্ত্বে ও আদর্শে আস্থা কিংবা মন্দিরে মসজিদে বিশ্বাস রাখা সম্ভব হয়না। আশু বিপদমুক্তির জন্যে বিপন্ন মানুষ জরুরী নিদান ও দ্রুত ফলপ্রাপ্তি কামনা করে। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত মানুষ পুরোনো শাস্ত্রে ও নীতি আদর্শে আস্থা হারিয়ে বিশ্বাসের নতুন বন্দরে নোঙ্গর ফেলে আশ্বস্ত হতে চায়, এ মনোভাব থেকেই ষোলো শতকের শেষপাদে ও সতেরো শতকের শোষিত, পীড়িত উদ্বিগ্ন মানুষ উদ্ভাবন করে নির্জিত দুস্থ মানুষের এক নিদান মন্ত্র—সে মন্ত্র হচ্ছে ‘সত্য’। যেন শাস্ত্র, সমাজ, সংসার, পুরোনো নিয়মনীতি সব জটাজটিল মায়াজাল, সব মিথ্যে। অনির্বাণ সত্য ছাড়া আর কিছু নেই, কেউ নেই—যে বা যা দুঃখ-যন্ত্রনা-বিপদ থেকে হীন-দুর্বল-অসহায় মানুষকে রক্ষা করতে পারে। সত্য নির্ভেজাল অকৃত্রিম। সত্য কাউকে কখনো প্রতারণা করেনা। হিন্দুরা বহুদেবতার পূজারী। হিন্দুর কাছে সহজেই সত্যস্বরূপ ইষ্টদেবতার প্রতিভূ নারায়ণ। মুসলিমমানে ছিল নিরাকার একেশ্বর-তত্ত্বের প্রবল ধারণা। তাই সত্য তাদের কাছে পীর। ইলাহী-ধর্মপ্রবর্তক আকবর ও জাহাঙ্গীরের উদারতার প্রশ্রয়ও এই পীর-নারায়ণ-সত্য মতবাদ প্রচারের সাহস যুগিয়েছে পরোক্ষে। নইলে জান-মাল-গর্দান হারাতে কোনো না কোনো প্রচারক। মনে হয় রাজকীয় সহযোগিতা ছিলোনা বলেই শাস্ত্রপতিরী ও সমাজ সর্দারেরা সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে।...শুনেছি বন্যার তোড়তাড়িত সাপও মানুষের সঙ্গে নিঃসঙ্কেচে বাস করে ভেলায়। একদিন স্বস্তিতে ভাতে কাপড়ে বাঁচবার আশ্রয়ে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত নির্জিত বিপন্ন দীন-দুঃখী হিন্দু-মুসলিম বাঙালি ‘সত্য’ নামের ভেলায় চড়ে বসেছিল...”^৫ লোকশ্রুতি অনুসারে ‘সত্যপীরের পাঁচালী’কে জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত ধর্মীয় সাহিত্য বলা চলে। দুটি

অর্বাচীন পুরাণেও এই কাহিনির উল্লেখ আছে। ঋন্দপুরাণের রেবাখণ্ড ও বৃহদ্রামপুরাণের উত্তরখণ্ডের কাহিনির সঙ্গে অনেকাংশেই এর মিল আছে। ঋন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে আছে- পুরাকালে শৌনকাদি ঋষিরা নৈমিষারণ্যে অবস্থিত মহর্ষি সুতের আশ্রমে যান। সেখানে মহর্ষির কাছে তাঁরা জানতে চান লৌকিক কষ্টমুক্তি, সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও পারলৌকিক সিদ্ধির জন্য সহজ উপায় কোনটি? মহর্ষি তাদের বলেন, এই একই প্রশ্ন দেবর্ষি নারদ ভগবান বিষুংকে করেছিলেন। ভগবান স্বয়ং নারদমুনিকে বলেন একটি ‘রাজমার্গের’ কথা। সেটি হল ‘সত্যনারায়ণ ব্রত’। যার অর্থ সত্যাচরণ, সত্যাগ্রহ, সত্যনিষ্ঠা। সংসারে সুখসমৃদ্ধি প্রাপ্তি একমাত্র সত্যাচরণ দ্বারাই সম্ভব। সত্যই সেখানে একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু কীভাবে? একমাত্র উপায় ঈশ্বর আরাধনা ও ভগবানের পূজাপ্রচার। কিছুলোক তাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য নিয়মিতভাবে এটি পাঠ করে। সমগ্র আখ্যানের মধ্যে দুটি বিষয় থাকে। যথা, ব্রতপূজা বা উপাসনা এবং ব্রতকথা বা গল্প। কাহিনির মধ্যে আবার দু’টি সাধারণ বিষয় বা থিম লক্ষ করা যায়। এক, সংকল্পটি ভুলে যাওয়া; দুই, প্রসাদের অপমান করা। ঋন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে সত্যদেবের আখ্যান রয়েছে পাঁচটি অধ্যায় জুড়ে। এই আখ্যানের আবার চারটি শাখা। প্রথম অধ্যায়ে সত্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত কাশীপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণের কাহিনি। সেখানে ব্রাহ্মণের কোনো নাম ছিল না। রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্রাহ্মণের নাম বিষুংশর্মা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাঠকেতু নামে একজন কাঠুরিয়ার আখ্যান। রামেশ্বরের কাহিনিতে মথুরা নগরের মনোহরপুরীর কাঠুরিয়াবৃত্তান্তে কাঠুরিয়ার কোনো নাম নেই। ভারতচন্দ্র আবার সাতজন কাঠুরিয়ার উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় জুড়ে রাজা উল্লামুখ ও রাণী ভদ্রশীলার আখ্যান, এরসঙ্গেই একজন দরিদ্র বণিকের গল্প আছে। কবি রামেশ্বর সদানন্দ বণিকের আখ্যানটি এখান থেকেই নিয়েছেন। কিন্তু ঋন্দপুরাণে কাহিনির সূত্রপাত করছে রাজা উল্লামুখ। সাধু-বৈশ্য সত্যনারায়ণের কাহিনি রাজা উল্লামুখের কাছে প্রথম শোনে। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনা। আবার তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়েও দিতে পারেনা। ভগবানের উপর তার শ্রদ্ধাও কম ছিল। তাই সে সন্তান-প্রাপ্তির পরই ব্রতপালনের সংকল্প করে। অর্থাৎ তিনি সংশয়বাদী ছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে। তারপর বৈশ্যের পত্নী লীলাবতীর গর্ভে কন্যা কলাবতীর জন্ম হয়। এদিকে বৈশ্য সংকল্পের কথা ভুলে যান এবং যথাসময়ে কন্যা কলাবতীর বিবাহ দেন। এরপর জামাতার সঙ্গে বাণিজ্যে যান। রাজা চন্দ্রকেতুর কাছে বন্দী হন। পরে সত্যনারায়ণের কৃপায় উদ্ধার পান। আখ্যানের এই প্রথমাংশটি রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র বর্জন করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে বংশধ্বজ রাজার কাহিনি, তিনি গোপগণের পূজা দেখার পর তাচ্ছিল্য করেন। তার রাজ্যনাশ হয় এবং পরে সত্যনারায়ণের পূজা করে পুনরায় রাজ্যলাভ করেন। এই কাহিনিটি রামেশ্বর বা ভারতচন্দ্রের কাব্যে নেই। রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে কাহিনিটি প্রায় একই ছাঁচে ঢালা। কেবল ‘প্রসাদে’র জায়গায় এখানে ‘শির্গি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘শির্গি’ একটি ফারসী-শব্দ। অতএব শুধুমাত্র বিষয় বা বক্তব্যের ক্ষেত্রেই নয়, ভাষাগত দিক থেকেও দু’টি ভিন্ন জাতি ও তাদের সংস্কৃতি একছাতার নীচে আসার চেষ্টা করছিল। রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র উভয়েই সংস্কৃতের পাশাপাশি ফারসী ও উর্দু-ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। এই ভাষাকেই রামেশ্বর ফকিরবেশী সত্যপীরের মুখে দিয়েছেন। যা নিঃসন্দেহে পাঠককে চমৎকৃত করে। অপরদিকে আছেন ‘সত্যপীর’; ‘সত্য’ হল আরবী ‘হক’-এর প্রতিশব্দ। সুফী ধর্মগুরুরা আল্লাকে ‘হক’ নামেই নির্দেশ করেছেন। ‘পীর’ কথার অর্থ ‘প্রাচীন’। পীর বলতে এক অতীন্দ্রিয় পথপ্রদর্শক অথবা সুফিকে বোঝায় যিনি শিষ্যদের দীক্ষা দেন ও গূঢ়-ধর্মীয়-তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পীরের ব্রতকথা রীতিমতো রচনা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে পীর-নারায়ণের একাত্মমূর্তি সমস্ত বাংলা জুড়ে এক নতুন দেবতা; ‘সত্যনারায়ণ’ বা ‘সত্যপীর’ রূপে আবির্ভূত হয়। কাব্য-মধ্যে সত্যপীর সম্পর্কে বলা হয়েছে,

“ত্রিপ্রকার নামের তাৎপর্য শুন আগে।

মিথ্যার বিনাশ হেতু সত্যপীর জাগে।।

নারায়ণ নামে সিন্ধি না হয় সম্ভব।

পীর হৈলে প্রাণ গেলে না পূজে হিন্দব।।”^৬

কিন্তু কেন? আগেই আমরা তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ জানতে চেষ্টা করেছি। এবার ‘ব্রতকথা’ সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া যাক।

৩

ব্-ধাতুর উত্তর অত্ (অতক্) প্রত্যয় যোগ করে 'ব্রত' শব্দটি সৃষ্ট। এর সাধারণ অর্থ নিয়ম বা সংযম। তাই ব্রত হল নিয়ম-সংযমের মধ্যদিয়ে কামনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে,

“কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।”^৭

বা

“বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ যে বিচিত্র কামনা করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো, বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বকার মানুষদের অনুষ্ঠান।”^৮

ব্রতের আদর্শ হল, একজন ব্যক্তিমানুষের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠানে পরিণত হওয়া। ব্রতকথার সঙ্গে ইংরেজী 'Ritual' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যে উচ্চারিত হতে পারে। অভিধানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে,

“a series of actions that are always performed in the same way, especially as part of a religious ceremony Or something that is done regularly and always in the same way”^৯

আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্নপ্রান্তে কিছু না কিছু সামাজিক, ঘরোয়া ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। কারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীন আবর্তের মধ্যে একটু নতুনত্বের স্বাদ পেতে চায়। জাতিগতভাবে বাঙালি খুবই আমোদপ্রিয়। বাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যেও নানারকম বৈচিত্র্য দেখা যায়। আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও আঞ্চলিক-প্রভেদ লক্ষ করা যায়। এই ধারায় ব্রত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাঙালিদের সম্পর্কে একটি প্রবাদ শোনা যায়, ‘বাঙালির বারোমাসে তেরো-পার্বণ’। ব্রত হল ধর্মের আচার-সংক্রান্ত একটি গার্হস্থ্য রূপ। তবে “লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে মহিলারাই”^{১০}। বঙ্গললনাদের সংস্কারবোধ, বিশ্বাস, ইচ্ছাপূরণ ও মঙ্গলকামনার তাগিদ, পার্থিব কামনা ও দেবতার বিরূপতা থেকে মুক্তির বাসনা এসমস্ত উদ্দেশ্য থেকেই ব্রতের উদ্ভব বলে মনে করা হয়। বাঙালি বাড়ির নারীরা আজও ভক্তিসহকারে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দুপুরে (সচরাচর এমনিটা দেখা যায়, তবে যেকোনো শুভদিনে, শুভক্ষণে ব্রতপালনের প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে) শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ-পাঁচালী, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পাঁচালী, শিবরাত্রি ব্রতকথা, ইতুপুজোর ব্রতকথা ইত্যাদি পাঠ করে থাকেন। এবারে আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

৪

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় রামেশ্বর সম্পর্কে লিখেছেন, “উপনিষদসমূহ একত্বের দিকে। কিন্তু তাহাতেও বহুত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই। মানুষের মনোভাব অনন্ত বলিয়াই এক এক ভাবের এক এক জন অনুগ্রাহক রূপে দেবতাগণও অনন্ত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। ... প্রবণশীল নদীসমূহ নানা পথে ঋজু বা কুটিল প্রবাহিত হইলেও তাহাদের গম্যস্থল একমাত্র সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যেমন ধাবিত হয়, সেইরূপ সাধকগণের রুচির বৈচিত্র্যে সাধনার বিভিন্ন ধারায় চলিয়া একই পরমেশ্বরে মিলিত হয়।”^{১১} বিশ্বের প্রতিটি ধর্মমতই সহিষ্ণুতার কথা বলেছে। প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে পারমার্থিক-শান্তি একটি সাধারণ বিষয়। ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার নীতি সাংবিধানিক ভাবেও স্বীকৃত। সত্যপীরের আখ্যানে আমরা দেখবো, কীভাবে হিন্দু-মুসলমান দু'টি ভিন্ন-সম্প্রদায় নিজেদের আলাদা আলাদা সংস্কৃতি, আচার-আচরণ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে ও শেষপর্যন্ত মিশে যাচ্ছে। সহাবস্থানের সূত্রেই হোক বা একই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানে থাকার কারণেই হোক; তা হয়েছে। কাব্যদুটি বিস্তারিত আলোচনা করলেই বিষয়টি অনেকবেশি স্পষ্ট হবে। কাব্যের শরীর-মন জুড়ে সেই বীজটি নিহিত আছে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলোর মতো এখানেও গণেশ বন্দনা দিয়ে কাব্যসূচনা হয়েছে। ‘সর্বদেব বন্দনা’ অংশে রামেশ্বর রহিমের রামরূপ তুলে ধরেছেন। বিষ্ণুর দশাবতার প্রসঙ্গে বলেছেন,

“পূর্বে হয়্যা দশমূর্তি করিলে অকীর্ত্ব কীর্তি
সত্যপীর হইলে ইদানী।”^{১২}

হিন্দুর উপাস্য বিষ্ণুকেই যে সত্যপীর করে গড়েছেন কবি রামেশ্বর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ত্রিগুণাতীত মনুষ্যের যে লক্ষণগুলি নির্দেশ করেছেন; সত্যনারায়ণ কথার পীরকেও তেমনি ‘সত্ত্ব-রজ-

তম' ত্রিগুণাধার বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে সচেতনভাবে কবি এই পদক্ষেপ নিচ্ছেন। 'গ্রন্থারম্ভ' অংশে ভগবান স্বয়ং নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

“বিধি মোর বড় ভাই মহেশ অনুজ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ।।
কংশ কেশি মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।।
... ..
ফকীর হইয়া আসি তোমার কারণ।
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ।।”^{১০}

বৈদিকযুগ থেকে হিন্দুধর্মে বহুদেবতার পূজা প্রচলিত আছে। প্রত্যেকটি দেবতা যেন বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। জল, আলো, বাতাস সমস্তকিছুর জন্য মানবসমাজ দেবতাদের আরাধনা করেছে। বৈদিক ঋষিরা স্পষ্টই বলেছেন, ‘একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।’ দেবতা প্রকৃতপক্ষে একই, নামে ও ত্রিগুণ বিভেদ। সত্যস্বরূপ একজনকেই উপাসকগণ বহু-নামে অভিহিত করেন। যেমন অগ্নি, বরুণ, পবন, ইন্দ্র, যম ইত্যাদি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো গ্রন্থোৎপত্তির কারণ আলাদা করে না থাকলেও ভগ্নিতায় কবি রামেশ্বর জানিয়েছেন, “ফকির ফিকিরে উরে নবঘনশ্যাম।/ হুকুম মাফিক হদ্দ বিরিচিল রাম।।”^{১১} অতঃপর শ্রীমাধবের পীরবেশে আবির্ভাব ঘটে। এর কারণ হিসেবে ‘ব্রাহ্মণ-সত্যপীর-সংবাদ’ অংশে প্রকৃত কাহিনির সূত্রপাত ঘটেছে। সত্যপীর ভুখা-ফকিরের ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মার কাছে আসেন। কিছুখাবার প্রার্থনা করেন। কিন্তু বিষ্ণুশর্মা নিজেই অভুক্ত, তাই সে অপারগ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখতে পাই, বিষ্ণুবিপ্র গাছের নীচে বসে নিজের দুর্দশার কথা ভাবছেন। এমন সময়,

“দীন দেখে দ্বিজবরে সত্যপীর কন তাঁরে
প্রকাশ করিতে অবতার।”^{১২}

কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্রাহ্মণের আত্মহনন প্রচেষ্টার প্রসঙ্গটি নেই। রামেশ্বরে আছে, “এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।/ পরকালে প্রভু পরিত্রাণ কর্য তুমি।।”^{১৩} পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল উৎপন্ন না হওয়ার সত্ত্বেও নানান অছিলায় জমিদারের নায়েব, গোমস্তারা প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত। বাংলাদেশে রাজার পর রাজা পরিবর্তন হয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সময় অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষের কোনো উন্নতি হয়নি। ধর্মীয় আদর্শে বাঙালির বৈশিষ্ট্য এইযে, তারা কখনোই তাদের দেবতাকে সুদূর স্বর্গের কল্পসিংহাসনে বসিয়ে শান্তি পায়নি। নিজের সুখ-দুঃখ, ব্যাথা-বেদনার মাঝে দেবতাকে টেনে এনে আনন্দলাভের চেষ্টা করেছে। রামেশ্বরের কাব্যে ভগবান নিজে এসে পূজা পদ্ধতি, সিন্ধির সামগ্রী প্রভৃতি অবগত করান। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তা ঘটেছে দৈববাণীর মাধ্যমে। যেমন,

“সম্বমে প্রণতি কর উঠে দেখে নাহি হরি
শূনে শুনে সির্গি ইতিহাস।”^{১৪}

রামেশ্বরের লেখায় ফকীরবেশে স্বয়ং সত্যপীর ব্রাহ্মণের কাছে এসে উপায় বাতলে দেন। অর্থাৎ কীভাবে দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তা ব্রাহ্মণকে অবহিত করাচ্ছেন এই বলে, “আপসেঁ চালায় দেড় সিরিনিকী সদ।/ কাঁহি তেরা হুকুম কিয়াগা নাহি রদ।।”^{১৫} ফলে সমস্যা আরও প্রকট হয়। যা শুধুমাত্র শারীরিক ক্ষুধায় সীমাবদ্ধ ছিল তা ধর্মের মূলে আঘাত করে বসল। ধর্মপ্রাণ বাঙালির আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কিছু আজন্ম-সংস্কার। যা আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে আচ্ছাদিত করে রাখে। সংস্কারকে মানুষ সহজে ত্যাগ করতে পারে না। তার মূল অনেক গভীরে প্রথিত। অতঃপর পীরনারায়ণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-বিষ্ণু শর্মার তর্ক উপস্থিত হয়। “দ্বিজ বলে দেওয়ান কহিলে মহাশয়।/ যবনের কার্য সেত ব্রাহ্মণের নয়।।”^{১৬} সত্যপীর ব্রাহ্মণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, “দেওয়ান কহেন শুন গেয়ানকি বাত।/ রাম রহমান নাম ধরে একনাথ।।”^{১৭} আমাদের মনে পড়বে আত্মপরিচয়ে ভগবান ঠিক একই কথা বলেছেন। কেন এমনটা প্রয়োজন হল? একটি উপকাহিনির দ্বারা কাব্যে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেটি হল কলির-আগমন। রাজা পরীক্ষিত মৃগয়াতে গিয়ে দেখেন একজন মানুষ

একটা গরুর উপর অত্যাচার করছে। রাজা অবাক হয়ে যান। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, “গরু নহে ধর্ম এই কলিকাল আমি।/ বধিব ইহা হারে বল কি করিবে তুমি।।”^{২১} রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই কলি একাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সময়টা আমাদের অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয়না। যেখানে রাজাদেশে, রাজার সম্মতিক্রমে অত্যাচারী নির্বিঘ্নে ধর্মের উপর কষাঘাত করে চলেছেন। পরীক্ষিত ভাবলেন, এভাবে চলতে পারে না। তিনি কলির সঙ্গে একটা রফা করলেন। শর্তানুসারে কলি সমস্ত জায়গাতে থাকতে পারে না। অতএব, “বুদ্ধিয়া নৃপতি চারি স্থল দিলা তারে।/ সুরা, সূনা, সুবর্ণবণিক স্বর্ণকারে।।”^{২২} এভাবেই পৃথিবীতে কলি জায়গা করে নিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে সামাজিক অকল্যাণের সঙ্গে জায়গাগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কলির লক্ষণ সম্পর্কে ভাগবতের অনুবাদ মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যকে পাশাপাশি স্মরণ করা যেতে পারে। কবি রামেশ্বর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

“অল্প সত্ত্ব হব লোক অল্প বুদ্ধি বল।

একপুয়া হব ধর্ম অধর্ম প্রবল।।”^{২৩}

... ..

“ভায়া না মানিব স্বামী করিব দুরাচার।

পরপুরুষ লইয়া করিব ঘরদ্বার।।”^{২৪}

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা

“জীবের যন্ত্রণা যত অধর্মের ফল।

পৃথিবীতে অল্প শস্য মেঘে অল্প জল।।”^{২৫}

... ..

“পুণ্যপথে কদাচিত আছে কোন নর।

পরদারে পরদ্রোহে প্রবৃত্তি বিস্তর।।”^{২৬}

যাইহোক, স্বয়ং ভগবানের মুখে কাহিনি শুনে ও সত্যস্বরূপ দর্শন করে বিষ্ণুশর্মার সংশয় দূর হয়। তিনি সিঁগি দিতে রাজি হয়ে যান। বিষ্ণুশর্মার পত্নীকেও (বিষ্ণুপ্রিয়া) ভগবান-বিষ্ণু তার পিতার ছদ্মবেশে পূজা-মাহাত্ম্য অবগত করান। কিন্তু সামাজিকতায় বাধে। সমাজ কিছুতেই মানতে চায়না। কেউই ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বাস করতে রাজি হয়না। সকলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে শুরু করে। রামেশ্বর তার বিস্তৃত বিবরণ দেন,

“বিপ্রভাগ দিতে আগে আজ্ঞা মাগে আস্যা।

ব্রাহ্মণ সকল সে বিকল হল হাস্যা।।

রাম রাম বল্যা কেহ কর্ণে দিল হাথ।

যবন হইল কেহ কহিল নির্ধাত।।

কেহ বলে দাড়ি রাখ মোজা পর পায়।

ন্যাড়া মাথা হল্যে সিন্ধি বড় শোভা পায়।।

কেহ বলে নামাজ করিতে ভাল জানে।

কৃষ্ণচন্দ্র ভজ্যা মুক্তি পাল্যে এতদিনে।।”^{২৭}

বিষ্ণুশর্মার মাতুল সার্বভৌম কুলাঙ্গার বলে গালি দেয়। একদিকে সামাজিক অবমাননা, অন্যদিকে পারিবারিক অসন্তোষ সমস্ত কিছু সহ্য করে ব্রাহ্মণ সত্যপীরের পূজা করতে চাইল। শেষে বিষ্ণুশর্মার অনুরোধে এক বিশেষ পরীক্ষার আয়োজন করা হল। তার শর্ত, “বেড়া অগ্নি দিয়া ঘরে প্রবেশিবে তায়।/ তাহাতে বাঁচিলে সিন্ধি খাব সর্বদায়।।”^{২৮} পাঁচালী কাব্যগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শর্তের বিনিময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা। শর্তটি সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ না হলে ঈশ্বরের কাছে নতিস্বীকার অর্থহীন। ভগবানও আপন মহিমা প্রকাশে বিশেষভাবে উৎসাহী। মনেহয় সেজন্যই কাব্যগুলির মধ্যে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এতবেশি। অতঃপর ব্রাহ্মণ শর্তে রাজি হল। তার ঘরে অগ্নি-সংযোগ করা হল। ব্রাহ্মণীকে নিয়ে সে প্রবেশ করল অগ্নিগৃহে। সবাই বিস্ময়ে দেখল, “যেমত জৌয়ের ঘরে জনক নন্দিনী।/ পৃথ্বী-পুত্রী কোলে করি রহিলা আপনি।।”^{২৯} এমনকি সত্যনারায়ণ স্বয়ং আবির্ভূত হলেন। মথুরেশ পুরীর সকলেই অবাক হয়ে সত্যনারায়ণের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করল। রামেশ্বর বর্ণনা করেছেন,

“হেন কালে যোগবলে প্রকাশিলা পীর।

দিব্য অট্টালিকা বাটী বেষ্টিত প্রাচীর।।

বাড়ি হৈল বিষ্ণুশর্মা বাঘে আসোয়ার।

দেখিয়া সকল লোক লাগে চমৎকার।”^{১০}

হিন্দু-মুসলমান উভয়সম্প্রদায়ই বাঘ ও চিতাকে পীরদের প্রতীক বলে মনে করত। সুন্দরবনের মুসলমান ভক্তরা দাবী করত বাঘের প্রকোপ এড়ানোর যাদুমন্ত্র তাদের জানা আছে। এদের মধ্যে আর্জান সর্দার, বেদে বাউলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু-মুসলমান দু’সম্প্রদায়ের জনগণই খাদ্যদ্রব্য ও কড়ি উপহার দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত। এরপর সকলেই বিশ্বাস করতে শুরু করে। এরপর পীর-সম্প্রদায়ের সিদ্ধাইয়ের কথা আছে। কাহিনিটি রামেশ্বরের নিজস্ব। ভারতচন্দ্রে এটি নেই। কাঠুরিয়া বৃত্তান্ত দু’টি কাব্যেই সংক্ষিপ্ত। এরপর সদানন্দ বণিকের উপাখ্যানে কোনো বিশেষত্ব নেই। কিছু অলৌকিক ও অতিলৌকিক ঘটনার সমাবেশে কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে। যেমন ব্রতের সংকল্প ভুলে যাওয়ায় সাধু সদানন্দের বন্ধন, সত্যনারায়ণের কৃপায় বন্ধনমোচন, পীরবেশে সদানন্দের সঙ্গে ছলনা ও শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

৫

সেসময়ের আমমুসলিম জনতা বাংলা-ভাষা জানত। বাংলাই ছিল তাদের মাতৃভাষা। এমনকি “তাহাদের মানসিক পটভূমি মুসলিম অপেক্ষা অধিকতর হিন্দু ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।”^{১১} তাছাড়া নিভৃত গ্রাম-পল্লীর ছায়ামিশ্রিত মধ্য এসমস্ত কাব্যের উৎপত্তি। তাই পল্লীরজীবনের সামাজিক-চিত্র এরমধ্যে ফুটে উঠেছে। এতে ঐতিহাসিকের প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস নেই। কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের ধারাটি বেশ সুস্পষ্ট। কারণ কবিরাও ব্যক্তিগতভাবে একটি সমাজ ও অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। তাদের চোখে সেই সেই অঞ্চলের ধর্মীয় ও সমাজজীবন নানা অভিজ্ঞতায় জারিত। তাই বাংলার সমাজ-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কাব্যটি আলোচনা করা দরকার। মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সুফিদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

“সুফীবাদ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া হইতে এদেশের শহর ও গ্রামে আসিয়াছিল।”^{১২}

এরা মূলত ধর্মীয়-শিক্ষা দিতেন। ধর্মশিক্ষা সেকালে শিক্ষারই একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে এর ফলাফল কীভাবে পড়েছিল? এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরাণের উদাহরণ টেনে বলেছেন,

“একদিন দৈত্যের সঙ্গে সংগ্রামে দেবতার হেরে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা আপনাদের গুরুপুত্রকে দৈত্যগুরুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। যাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই বিদ্যা দেবলোকে আনাই ছিল তাঁদের সঙ্কল্প। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেননি যে, ‘দানবী বিদ্যাকে আমরা চাইনে।’ দানবদের কাছ থেকে বিদ্যা নিয়ে তাঁরা দানবপুরী বানাতে ইচ্ছা করেন নি। সেই বিদ্যা নিয়ে তাঁরা স্বর্গকেই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দানবের ব্যবহার স্বর্গের ব্যবহার না হতে পারে, কিন্তু যে বিদ্যা দানবকে শক্তি দিয়েছে সেই বিদ্যাই দেবতাকেও শক্তি দেয়-বিদ্যার মধ্যে জাতিভেদ নেই।”^{১৩}

ধর্ম ও বিদ্যা তা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন; যদি কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। পীরগাথা রচনার অন্তরালে তৎকালীন বাংলাদেশের ইতিহাস অনেকাংশে যুক্ত। সেটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব, কেন এই দু’টি সম্প্রদায় সাহিত্যের আঙিনায় সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়! ১২০৩ খ্রিস্টাব্দের তুর্কি অধিকারের সূত্র ধরেই এদেশে মুসলমান সাধু ও ধর্মপ্রচারকদের আগমন ঘটতে থাকে। মুসলমান সাধুর মাহাত্ম্যও সেকালের জনসাধারণের মধ্যে ভয়ভক্তি জাগাতে সাহায্য করেছিল। এছাড়া সুফী সম্প্রদায়ের গুরুনিষ্ঠা ও ভক্তি সেকালের বাঙালির মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সেজন্য মনের অনুকূলতাও অনেকাংশে দায়ী। বাঙালির মনের সে অনুকূলতা হল দৈবনির্ভরতা ও অলৌকিক জ্যোতিষে বিশ্বাস। এবিষয়ে সুকুমার সেনের বক্তব্য, “পীরদের সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধারণের যে ভয়ভক্তি তাহার সবটাই সুফী মতের বা গোঁড়া মুসলমানের ধর্মের দান নহে, ইহা এদেশের জনসাধারণেরও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। যোগী বা তান্ত্রিক সাধুদের সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধারণের যে সুদৃঢ় মোহ ছিল তাহাই ইহার মূলে।”^{১৪} রাষ্ট্রজীবন ও সমাজ-পরিবেশের প্রভাব সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রকাশলাভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙালির জাতীয় জীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল তার কুলপঞ্জি উদ্ধার করা খুব শক্ত নয়। মোগল শাসনের

সূর্য তখন স্নান সন্ধ্যার তীরে অস্তমিত। শক্তিহীন কেন্দ্রীয় শাসনশক্তির ফলে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে দুর্বল, আর রাজকর্মচারীরা হয়ে ওঠে যথেষ্টাচারী। পাশাপাশি চলতে থাকে পরদেশী বণিকের লোলুপতা। এই সময়কে ইতিহাস দ্বৈতশাসনের কাল বলেছে। কিন্তু জনগণমানসে শাসন ছিল ত্রিবিধ। নবাবী শাসন, কোম্পানীর শাসন এবং নবাবের দ্বারা নিযুক্ত ও পরিচালিত রাজস্বাদায়কারীদের শাসন। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে এই ত্রিবিধ অভিশাপ বাঙালিকে আশা-আকাঙ্ক্ষাহীন, কিছুটা জড়-শক্তিতে পরিণত করেছিল। ১৭০৭ খ্রীঃ মোগল সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয়-শক্তি একেবারে ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশও এই তরঙ্গাভিঘাত থেকে মুক্ত ছিলনা। মুর্শিদকুলি খাঁ কিছুটা বিশৃঙ্খলা দমন করলেও নবপ্রতিষ্ঠিত ইজারাদারগণ ধনী শ্রেণীতে পরিণত হল। তারা অর্থের জন্য কেবলমাত্র কৃষিজ ফসলের ওপর নির্ভর করতে শুরু করল। এছাড়া এই নব-ভূস্বামীগণ মোগল-বিলাসকলাকেই জীবনের আদর্শ মনে করে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অধঃপতনের স্রোতে ভেসে চলল। এই সময় বাংলাদেশের গৃহযুদ্ধও জোরকদমে চলছে। সংস্কৃত পঠন-পাঠনের অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ছিল। তারাও বৃহত্তর কোনো আদর্শের স্বাক্ষর না করে সংকীর্ণ সংস্কারের বন্ধনে সাধারণের জীবনে আড়ষ্টতা নিয়ে আসে। বঙ্গদেশে জাতিভেদ-প্রথার অন্যতম ফলস্বরূপ নিম্নবর্গের মানুষদের লাঞ্ছনার সীমা ছিলনা। তাই তারাও অনেকক্ষেত্রে মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ইসলামধর্ম ও বিশ্বাসে আস্থা রাখতে শুরু করে। অন্যদিকে দরিদ্র, নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-সম্প্রদায়ও আরবী, ফারসী জ্ঞানচর্চার জগৎ থেকে দূরে ছিল। তারাও সুযোগ খুঁজছিল। ইসলাম ধর্মপ্রচারক ও ব্যাখ্যাতারা এদেশীয় সংস্কারগুলিকে নিজেদের ধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে একটা সামাজিক রফার চেষ্টা করেছিল। এভাবেই পীর-সম্প্রদায় বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়জীবনে প্রভাববিস্তার করতে শুরু করে। এরফলে সত্যনারায়ণ সত্যপীর নামে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ও সমাজ-অভ্যন্তরে যে ত্রুটি ছিল তার বর্ণনা কাব্যেও পাওয়া যায়। রাজার রাজ্যশাসন কেমন ছিল? “পাপে পরিপূর্ণা পৃথ্বী হরিলেন শস্য।/ প্রজার উপর হল রাজার দুর্দৃশ্য।”^{৩৫} জমিদাররা রায়তদের থেকে অতিরিক্ত হারে কর আদায় করতে থাকেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাকে অজুহাত বলতে থাকেন। পরিবর্ত পরিস্থিতিতে তারা কিছুতেই কর (বর্তমানে income tax) ছাড় দিতনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সাধারণ মানুষের জমির উপর কোনো ব্যক্তিগত অধিকার ছিলনা। ফলে জমিদাররাও নিজেদের ইচ্ছামতো প্রজা-নির্ধারণ করতেন। নিম্নবর্গের মানুষের অসহায়তার সীমা ছিলনা। খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীর দিকে হিন্দু-মুসলমান মিশ্রদেবতা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের উপাসনা বা সির্গি-বন্টন প্রচলিত হয়, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনার ধুম পড়ে যায়। এই মিশ্রদেবতা পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ধর্মবিশ্বাস একসূত্রে মিলিত হয়েছে। সুকুমার সেনের মতে –

“তুর্কী অধিকারের পর বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের দুটি মিলনভূমি প্রস্তুত হয়েছিল-শাসকের দরবার ও পীরের আস্তানা।”^{৩৬}

মুসলমান পীরের আস্তানায় জাতিভেদের গণ্ডী ও ছুঁই-ছুঁইয়ের বেড়া না থাকায় সাধারণ লোকে সেখানে গেলেই এমন খানিকটা আশ্বাস ও নির্ভরতা পেত, যা তারা আগে অন্যকোনো দেবস্থানে পায়নি। পীরেরা প্রায়ই পুরানো হিন্দু-সিদ্ধস্থানের সন্নিকটে আস্তানা গাড়ত। সেই যোগাযোগে প্রাচীন হিন্দুদেবতাদের উত্তরাধিকারও কিছুটা তারা পেয়েছিল। ফলে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজ-মানসে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে একজন মিশ্রদেবতার পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। এবং তা রাঢ়ভূমিতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাধারণত হিন্দুদের ঘরে ইনি সত্যনারায়ণ ও মুসলমানদের কাছে সত্যপীর নামে গৃহীত হয়েছেন। আবার হিন্দুরা সত্যনারায়ণ বলে এই পূজা করলেও সির্গি-বন্টনে পুরোপুরি মুসলমানি-রীতি বজায় রেখেছিল। সুতরাং বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের শেষদিকে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ কাহিনীর মধ্যদিয়ে দু’সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মিলন-প্রচেষ্টা হচ্ছিল। এবং সে প্রচেষ্টা দু’তরফেই হয়েছিল। সে সম্বন্ধে কেমন? “হিন্দুরা পীর-গাথার লেখক, মুসলমানেরা পীর গাথার গায়ক।”^{৩৭} ভারতচন্দ্রের কাব্য ত্রিপদী-ছন্দে রচিত। পূর্বে বর্ণিত তিনটি কাহিনীকে তিনি একটি অংশের মধ্যেই বিচ্ছিন্নভাবে ক্রমান্বয়ে সাজিয়েছেন। তবে একথাও বলেছেন,

“এ তিন জনার কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা
বুদ্ধিরূপ কৈলা নানা জন।”^{৩৮}

রামেশ্বর তিনটি কাহিনির মধ্যে ক্ষীণ-যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল, এই পূজাপদ্ধতি, সির্গি-সামগ্রী ও গল্প-কাহিনি একজনের মুখ থেকে আরেকজনের মুখে ছড়িয়ে পড়লেই তাঁর পরিশ্রম সার্থক। এখানে একটি কাহিনির শেষে পরবর্তী-কাহিনির সূচনা ও পূর্ব-কাহিনির সঙ্গে তার যোগসূত্রকে সুচারুভাবে আঁকা হয়েছে। তাই প্রথম কাহিনি শেষ হলে তা কাঠুরিয়াদের কাছে ব্যক্ত হয়। বলা হয়, “বিষ্ণুশর্মা উপাখ্যান শুনিলে সকল।/উপস্থিত পূজার সাক্ষাৎ লভে ফল।।”^{৯৬} আবার কাঠুরিয়া বৃত্তান্ত শেষ করছেন এভাবে,

“সংক্ষেপে সে সব কথা কহে রামেশ্বর।/ সদানন্দ হইতে ক্রমে শুন অতঃপর।।”^{৯৭}

চৌপদী-ছন্দে লেখা ভারতচন্দ্রের আরও একটি সত্যপীর-পাঁচালী আছে। কাব্যটি অষ্টমঙ্গলার চণ্ডে লেখা। প্রথম তিনটি মঙ্গলাচরণে বিষ্ণুশর্মার কাহিনি, চতুর্থ মঙ্গলাচরণে কাঠুরিয়া বৃত্তান্ত, পঞ্চম থেকে অষ্টম মঙ্গলাচরণে সদানন্দ বণিকের আখ্যান। একেবারে শেষে কবির আত্মপরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। পুঁথি রচনার কারণও বলেছেন,

“ভরদ্বাজ অবতংশ	ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংস	ভূরসুটে বসতি।” ^{৯৮}
...
“সব কৈল অনুমতি	সংক্ষেপ করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি	না করিও দূষণ।” ^{৯৯}

রামেশ্বরের কাব্যটির শেষে ‘অথ অষ্টমঙ্গলা’ নামে আলাদা একটি অংশ আছে। সেখানে আসর-বন্দনা, গায়ন ও বাদকদের জন্য কল্যাণ-কামনা, দক্ষিণা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ আছে। একইসঙ্গে পীর-পৈগাম্বর ও ব্যাস-বাল্মীকির কথাও উল্লেখিত হয়েছে,

“অবশ্য দক্ষিণা দিবে না হবে কাতর।
তবে দয়া করিবেন পীর পৈগাম্বর।।
দেবের দক্ষিণা দেখ ব্রাহ্মণের হয়।
ব্যাস-বাল্মীকি মুণিগন ইহা কয়।।”^{১০০}

৬

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লুই-ফিসার মন্তব্য করেছিলেন,

“ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; আর, ভারতবর্ষের শতকরা নব্বুই ভাগই হল এই গ্রাম। হিন্দু-মুসলিম সমস্যা মানুষেরই তৈরি, এ সমস্যা শহরের, কর্মসংস্থানের পর্যাণ্ড ব্যবস্থা যেখানে নেই এই সমস্যায় সেই শহর জীবনই প্রতিবিম্বিত হয়েছে।”^{১০১}

এই মন্তব্যটি স্বাধীনতা ও দেশভাগ-সমকালের হলেও এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কেননা আমাদের বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগের দিকে তাকালে বোঝা যায়, হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সমস্যা খুব একটা প্রাচীন নয়। প্রাচীনযুগ বা চর্যাপদে এই দু’সম্প্রদায়ের উল্লেখই নেই। সেখানে বৌদ্ধ সাধকেরাই একমাত্র সাধক এবং তারাই চর্যার পদগুলির রচয়িতা। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক আখ্যানেও হিন্দু-মুসলমানের উল্লেখ নেই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এধরনের সাম্প্রদায়িকতার কথা নেই। মধ্যযুগে ধর্মাস্তরের কথা প্রথম উঠে আসে। কিন্তু কেন? ইতিহাস থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বর্ণভেদ-প্রথার কঠোরতা অন্ত্যজবর্গের মানুষদের সামাজিকজীবন দুর্বিষহ করে তোলে। ফলে বৌদ্ধদের অবস্থা খুবই করুণ হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন জীবনে ক্রিয়াকর্ম এবং সামাজিক জীবনের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কৃতিই হয়ে ওঠে সর্বসর্বা। নিম্নবর্গের মানুষেরা অমানুষিক পরিশ্রম করেও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। অগণিত সাধারণ মানুষ, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আক্রোশ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে। সামাজিক সংহতি শিথিল হয়ে যায়। ঠিক তখন, বাংলায় ইসলামিক-শাসন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই সুফীধর্মগুরুরা আসতে থাকে। শাসন-প্রতিষ্ঠা হবার পর তাদের

সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে সুফীধর্ম প্রচারের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যাচার থেকে মুক্তি ও ইসলামধর্মের সাম্যনীতির আকর্ষণে বহুমানুষ ধর্মান্তরিত হয় স্বেচ্ছায়। তাই একহাতে কোরাণ ও অন্যহাতে কৃপাণ নিয়ে ইসলাম ধর্মপ্রচারের লোকশ্রুতি সর্বৈব সত্য নয়। আবার নিম্নবর্ণের মানুষমাত্রই ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে তেমনটাও নয়। রাজপদ-লাভের আশায় অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দুও ধর্মান্তর স্বীকার করেছে। আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না, মধ্যযুগে এই দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার সূত্রে সৌহার্দ্যপূর্ণ সুস্থ-সম্পর্ক স্থাপিত না হলেও দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাসের একটা প্রস্তুতি অবশ্যই শুরু হয়েছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে। যেমন সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুকবিদের গ্রন্থরচনা, রাজকার্যে হিন্দু-কর্মচারী নিয়োগ, মুসলমানি পোষাক ব্যবহার, এমনকি রাজদরবারে হিন্দুআচার পালনেও কুণ্ডা ছিলনা; এমনকি নবাবদের হোলি-উৎসব, হিন্দু-মুসলমানের বৈবাহিক সম্পর্কের কথাও শোনা যায়। আমরা জানি পরবর্তীতে বাউল-সাধনায় মিলনের ক্ষেত্রভূমি প্রস্তুত হয়েছিল। এরপর আধুনিক-যুগ স্পষ্টভাবেই হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের যুগ। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় থেকে আজ অবধি ভারতের বৃহত্তর সমস্যাগুলির মধ্যে 'সাম্প্রদায়িক-সমস্যা' অন্যতম। বুদ্ধিজীবীমহলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। অথচ সার্বিকভাবে কোনো সমাধান আজও হয়নি। কখনো হবে কিনা তা মহাকালের বিচারাধীন। রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের ক্ষুদ্র দু'টিকাব্যের বিশেষত্বই হল, এর মানবধর্মের দিক। একেবারে খাঁটি এই পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুর্দশা ও ধর্মবিশ্বাস চিত্রিত হয়েছে; এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নেই। পাঁচালী শেষ হয়েছে পাঠক বা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবাণীর মধ্যদিয়ে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও এই রীতি বজায় ছিল। যা পাঁচালীরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলা হয়,

“এ কথা শ্রবণকালে যেবা অন্য কথা তুলে
আর যেবা করে উপহাস।
লাঙ্ঘিত সে সর্ব্বথাঞ তাহার নিকৃতি নাঞ
অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ।।”^{৪৫}

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের মতো পাঁচালীর সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরও ভয়কে কার্যসিদ্ধির উপায় বলে মনে করেছেন। তবে মানবতায় ও সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে কাব্যগুলি অসাধারণ। পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। পুনরায় সত্যনারায়ণকে হিন্দুত্বের দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছে স্বার্থান্ধ রক্ষণশীল একটি গোষ্ঠী। গ্রাম্যদেবতার পূজাগুলি; যেমন মনসা, শীতলা, সত্যপীর ইত্যাদিকে শাস্ত্রীয় করে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা উপার্জনের কিছু সুবিধা করে নেয়। কিন্তু এসমস্ত পূজা নিতান্তই সাধারণ মানুষের। সেখানে তন্ত্রধারক ব্রাহ্মণের প্রয়োজনই ছিলনা। ব্রাহ্মণদের এহেন আচরণের ফলে মুসলমান-পীরকে লোকে যেমনি পূজা দিতে শুরু করল অমনি ব্রাহ্মণরা তাকে সত্যনারায়ণ বলে প্রচার করে ব্রতটির উপর হিন্দুধর্মের দখল বসাল। কিন্তু বাংলায় সত্যনারায়ণের যে পাঁচালী সেখানে পীরকে মুসলমানি পোষাকই দেওয়া হয়েছে। এই মুসলমান-পীরের উপাসনা ও সির্গি-প্রথা ব্রাহ্মণদের ঘরেও চলে এসেছে। কিন্তু এরমধ্যেই বাংলায় ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা ব্রতকথা থেকে মুসলমানি অংশটিকে একেবারে চেপে দেবার চেষ্টা করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে জানা যায় ভাটপাড়ার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শর্মা 'ব্রতমালাবিধানে'র ভূমিকায় জানিয়েছিলেন, নারায়ণের পাঁচালীতে পুরোহিতদের আপত্তি রয়েছে। ব্রতমালায় এই পাঁচালী স্থান পেতে পারেনা। তাই ইচ্ছাসত্ত্বেও বীরেন্দ্রনাথ শর্মা নারায়ণ-পীরের পাঁচালীকে 'ব্রতমালাবিধানে' সন্নিবেশিত করতে পারেননি। আসল কারণটা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না। পীরের সির্গি বা ভোগটা হচ্ছে সুজি, বাতাসা; হিন্দুয়ানিতে বাধেনা এমন সব জিনিসে। এবং সেটা এখন প্রায় পায়েসের দলে চলে এসেছে। কিন্তু একথা সত্য যে, পীর যিনি তিনি পীরই; তিনি বিষুও নন, নারায়ণও নন। সুতরাং সেই পাঁচালীটাকেই লোপ করে দিতে পারলে সত্যনারায়ণের হিন্দুত্ব নিকৃষ্টক হয়ে যাবে। কিন্তু তা কি সম্ভব? হয়তো সম্ভব। তাই আজ গ্রামবাংলার অনেক জায়গাতেই সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর আলাদা দেবতা। সত্যপীর নামটি কাব্যের মধ্যেই থেকে গেছে। নির্বোধ মানুষ কেবল পাঠ করে যায়। বর্তমানে অনেক পাঁচালীগ্রন্থে কাহিনীর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সেখানে সত্যনারায়ণই একমাত্র দেবতা বলে স্বীকৃত। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগের এই দু'জন

কবিকে মনে রাখবে; আজীবন খাণী হয়ে থাকবে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের এহেন অপূর্ব মেলবন্ধনের কারণে। সচেতন সাহিত্য-পাঠক হিসেবে আমরাও চেষ্টা করব কাহিনিটিকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সুকুমার, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০
২. তদেব
৩. Das, Sisirkumar, The Mad Lover, Papyrus, 1984, Reprint: February 2018, P. 51
৪. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০৯
৫. শরীফ, আহমদ, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), নয়া উদ্যোগ, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃ. ৪৩৯
৬. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১৬
৭. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ ১লা শ্রাবণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫
৮. তদেব, পৃ. ১৫
৯. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, First Published 1948, Oxford University Press, P. 1340
১০. বসাক, শিলা, বাংলার ব্রতপার্বণ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৮ খ্রীঃ, পৃ. ১৮
১১. দত্তগুপ্ত, শ্রীঅক্ষয়কুমার, প্রবাসী পত্রিকা (প্রবন্ধ-রামেশ্বর), ভাদ্র ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ
১২. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১০
১৩. তদেব, পৃ. ৫১১
১৪. তদেব, পৃ. ৫১৩
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯২
১৬. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১২
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯২
১৮. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১৩
১৯. তদেব
২০. তদেব
২১. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১৪
২২. তদেব
২৩. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রাণা সুমঙ্গল (সম্পা.) মালাধর বসু অনুদীত শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৭২

২৪. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ,
পৃ. ৫১৫
২৫. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রাণা সুমঙ্গল (সম্পা.) মালাধর বসু অনূদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৭২
২৬. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ,
পৃ. ৫১৪
২৭. তদেব, পৃ. ৫১৮
২৮. তদেব
২৯. তদেব, পৃ. ৫১৯
৩০. তদেব
৩১. সরকার, জগদীশনারায়ণ, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭
৩২. তদেব, পৃ. ৫৬
৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ ২৩ মাঘ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৫
৩৪. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০ খ্রিঃ,
পৃ. ৩৯৮
৩৫. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ,
পৃ. ৫১৫
৩৬. সেন, সুভদ্রকুমার ও সেন, সুনন্দনকুমার (সম্পা.) সুকুমার সেনের প্রবন্ধ-সংকলন(১), প্রবন্ধ 'বাংলার
সংস্কৃতিতে মুসলমান প্রভাব ও মুসলমানী কেছা'; প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ, পৃ. ৬৫৩
৩৭. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০খ্রিঃ,
পৃ. ৩৯৮
৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম
প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯৪
৩৯. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ,
পৃ. ৫২০
৪০. তদেব, পৃ. ৫২১
৪১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম
প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯৭
৪২. তদেব
৪৩. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ,
পৃ. ৫২৬
৪৪. গোস্বামী, অর্জুন (সংকলিত, সম্পাদিত ও অনূদিত), দেশভাগ দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (The Great
Question-এর নির্বাচিত ও অনূদিত অংশ), গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রিঃ, পৃ. ১২৪
৪৫. চক্রবর্তী, পঞ্চগনন (সম্পা.), রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ,
পৃ. ৫২৫